গ্রন্থ-সমীক্ষা

‘মধুর, তোমার শেষ যে না পাই’

প্রসাদ

Swami Chetanananda, *See God with Open Eyes,* (Vedanta Society of St. Louis, U.S.A.), First Edition 2018, $ 29.95

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে স্বামী চেতনানন্দ একটি চিরস্মরণীয় নাম। বাংলায় এবং ইংরেজিতে ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর বিষয়ে (এবং আরও অনেক বিষয়ে) বহু মৌলিক এবং অনুবাদগ্রন্থ তিনি লিখেছেন। এর সঙ্গে আছে তাঁর দ্বারা সংকলিত এবং সম্পাদিত ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী সংক্রান্ত সব রকমের ফোটোর একাধিক উচ্চমানের অ্যালবাম (দুই ভাষাতেই)। অপরিশোধ্য ঋণের পাশে তিনি বেঁধে ফেলেছেন আমাদের সকলকে, ভবিষ্যতের প্রজন্মকেও।

এবারে মহারাজ উপহার দিলেন আর এক মহাগ্রন্থ—‘See God with Open Eyes’। এটি ‘ধ্যানলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ’ বইটির আধারে লেখা হলেও বাংলা বইটির আক্ষরিক অনুবাদ নয়।

এই বইটির কোনও সমালোচনা হয় না, এটি বারবার পড়বার বই, ধ্যান করবার বই। বইটিতে ‘অবতরণিকা’ ছাড়া আরও সতেরোটি অধ্যায় রয়েছে। কত বিচিত্র উপায়ে ঠাকুরের ধ্যান করা যায় তা পূজনীয় মহারাজ শিখিয়েছেন সহজ সরল ভাষায়, যথোপযুক্ত উদাহরণ সহযোগে। যেমন ‘শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গধ্যান’, ‘শ্রীরামকৃষ্ণের মন-ধ্যান’, ‘শ্রীরামকৃষ্ণের গুণধ্যান’ ইত্যাদি। এছাড়াও আছে কয়েকটি উচ্চাঙ্গের গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ যেমন ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের ইতিবৃত্ত’, ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ইতিবৃত্ত’। ধ্যানের বিষয়ে আছে ‘ধ্যানতত্ত্বে কৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ’, ‘নববর্ষের ধ্যান’, ‘ধ্যানমঙ্গলম্’ ইত্যাদি। মননশীল প্রবন্ধও আছে—‘শ্রীরামকৃষ্ণ-শাস্ত্র’, ‘শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর সর্বব্যাপিতা’। ইংরেজি গ্রন্থটির পরিশিষ্টে রয়েছে একটি অত্যন্ত মননশীল প্রবন্ধ, ‘নূতন ধর্ম রূপ নিল এ জগতে’ (‘A New Religion Begins’)। এই প্রবন্ধটির (১৯৮০ সালে লেখা) বঙ্গানুবাদ ‘ধ্যানলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ’-তে পাবেন না (পরবর্তী সংস্করণে এটি দেওয়া যায় কি না ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি)। আজ থেকে প্রায় চার দশক আগে রচিত এই লেখাতে মহারাজ কয়েকটি সুগভীর কথা লিখেছিলেন, ‘‘যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে, ‘আচ্ছা, আপনি কি বলতে পারেন, একবিংশ শতাব্দীতে ধর্মের কোন বিশেষ রূপটি সবচেয়ে বড় ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে?’ তাহলে

আমার একটাই উত্তর হবে—মিস্টিসিজম।” এই ‘মিস্টিসিজম’ শব্দটির সঠিক বঙ্গীকরণ কীভাবে করব জানি না। ‘মরমিয়াবাদ’, ‘অপরোক্ষানুভূতি’ এইসব শব্দগুলি দিয়ে কিছুটা বোঝানো গেলেও সবটা বোঝানো যাবে না। অন্তত, চেতনানন্দজী যেভাবে বোঝাতে চেয়েছেন, সেভাবে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। মহারাজের কথাই তুলে দিচ্ছি—“Mysticism is communion with God–experience of one’s own Self through meditation and love. Mysticism does not belong exclusively to Christianity, Judaism, Hinduism, Buddism, or Islam, yet it exists in all of these.”

চল্লিশ বছর আগেই মহারাজ এক আশ্চর্য ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন—“Only in Spirit are we all one. Both modern science and religion are now moving toward Unity–the mysterios Oneness where there is no space, time or causation, where there is neither bondage nor liberation, nor any pair of opposites. This is the realm of mysticism.” নির্ভুল এবং অব্যর্থ ভবিষ্যদ্‌বাণী! সত্যিই আজ আধুনিক বিজ্ঞান আর ধর্ম (বিশেষত বেদান্ত) একই কথা বলছেন।

যাঁরা ‘ধ্যানলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ’ পড়েছেন, তাঁরা এই ইংরেজি বইতেও অনুরূপ রসাস্বাদন করবেন তা বলাই যায়, কারণ এটিও ‘স্বাদু স্বাদু পদে পদে’। একটা সংশয় অবশ্য থেকে গেল। এটি তো মূলত ধ্যানের বই, এবং ধ্যান তো সাধারণত করতে হয় চোখ বন্ধ করে। তাহলে এই বইয়ের নাম ‘খোলা চোখে ঈশ্বরকে দেখো’ কেন তা বুঝতে পারলাম না। ‘ধ্যানলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ’ নামটি অনেক বেশি অর্থবহ এবং সুপ্রযুক্ত হয়েছিল।

মহারাজ একটি মজার লেখাও দিয়েছেন এই বইতে—এক সাংবাদিকের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের এক কাল্পনিক সাক্ষাৎকারের বিবরণ। যেহেতু গোটা ব্যাপারটিই কাল্পনিক, তাই এই বিষয়ে তর্কের বিশেষ কোনও অবকাশ নেই। তবু, তাঁকে কয়েকটি বিনীত প্রশ্ন করার আছে। ওই কাল্পনিক সাক্ষাৎকারে তিনি ঠাকুরের মুখে সংলাপ বসিয়েছেন (পৃঃ ৪২৫)—“Don’t talk about Bengalis, they are very emotional and sentimental, and their excitement goes up and down like the waves, Most Bengalis buy the Kathamrita to keep it in their bookcases. How many actually read it?” [বাঙালিদের কথা আর বোলো না; এরা খুব আবেগপ্রবণ এবং ভাবপ্রবণ জাত, এদের উৎসাহ তরঙ্গাকারে চলে—কখনও বাড়ে, কখনও কমে। অধিকাংশ বাঙালি কথামৃত কিনে বইয়ের আলমারিতে সাজিয়ে রাখে। সত্যি সত্যি পড়ে ক-জন?]

নাঃ, এত বড় অভিযোগ মানতে পারলাম না। পূজনীয় মহারাজ তো জানেন যে ‘কথামৃত’ প্রকাশের পর থেকেই বাঙালিদের কাছে বেদ-বেদান্তের তুল্য (বা, ততোধিক)। বর্তমান কালে ঠাকুর তো প্রায় সকল ‘ভাবপ্রবণ’ বাঙালির ঘরে ঘরে গৃহদেবতার আসনে অধিষ্ঠিত। সেই বাঙালিদের অধিকাংশই ‘কথামৃত’ কিনে বইয়ের আলমারিতে সাজিয়ে রাখেন, কিন্তু বইটি সত্যি সত্যি পড়েন না—এই কথা বলে কি শ্রদ্ধেয় লেখক বাঙালি পাঠক এবং ভক্তদের প্রতি গভীর অবিচার করলেন না? পাঠক তো বই পড়বেন বলেই তাঁদের কষ্টার্জিত টাকা দিয়ে ‘কথামৃত’ ও অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্যের বই কেনেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর বিষয়ে কোনও ভাল বই প্রকাশিত হলে তা সঙ্গে সঙ্গে বেস্ট সেলার হয়। কেন? কারণ দিব্যত্রয়ী এখন আমাদের পরিবারের খুব প্রিয় সদস্য হয়ে গেছেন। তাঁদের পবিত্র সঙ্গ আর আশ্বাসবাহী আশ্রয় ছাড়া আমরা থাকতেই পারি

না। তাঁদের মতো এমন টানে কেউ তো টানে না!

তারপরে, মহারাজ ঠাকুরের জবানিতে লিখেছেন, 'Nowadays, I see that non-Bengalis and foreigners are studying my life seriously.' [আজকাল দেখছি, অবাঙালিরা ও বিদেশিরা আমার জীবন ও বাণী নিয়ে বেশি পড়াশোনা করছে।] মহারাজ নিজে সুদীর্ঘকাল আমেরিকাবাসী, তাই তাঁর কথা শিরোধার্য। কিন্তু মনে কতকগুলো প্রশ্ন উঠছেই, এখানে সেগুলি সবিনয়ে নিবেদন করছি সুমীমাংসার আশায়। সত্যি, অনেক বরেণ্য লেখক-লেখিকা অসামান্য বই লিখে শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন, যেমন—গোপাল স্ট্যাভিগ, অমৃতা স্যাম, লিন্ডা প্রুঘ, প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা প্রমুখ। কিন্তু, শ্বেতাঙ্গ লেখকদের লেখা সব বই-ই যে খুব মহৎ তাও নয়। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের ইংরেজি জীবনীকার এবং বিখ্যাত লেখক ক্রিস্টোফার ইশারউডের লেখা একটি আত্মজীবনীমূলক বই ('My Guru and His Disciple'), যা প্রকাশিত হওয়ামাত্রই সমস্ত পাঠকমহলে ধিক্কৃত ও পরিত্যক্ত হয়েছে। এর কয়েক বছর পর (১৯৯৫ সালে) জেফ্রি জে ক্রাইপাল নামে এক ভুঁইফোড় লেখক একটা ঘৃণ্য বই লিখলেন। সেই অপগ্রন্থটির নাম : 'Kali's Child'। বোঝাই যায়, তিনি বিশুদ্ধ বাণিজ্যিক কারণেই বইটি লিখেছিলেন। কোনও 'হুজুগে ভাবপ্রবণ' বাঙালি সেই ধরনের বই লেখা তো দূরের কথা, বইটি ধৈর্য ধরে পড়তেও পারবেন কি না সন্দেহ!

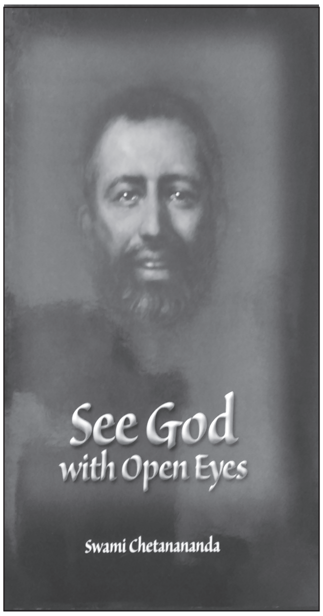

দ্বিতীয়ত, 'অবাঙালিরা ও বিদেশিরা' শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী নিয়ে যদি বেশি পড়াশোনা করছে, তাহলে মঠ-মিশন থেকে কেবলমাত্র ঠাকুরের সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় একের পর এক সুবৃহৎ এবং মহৎ গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে কীভাবে? যেমন—বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ (১৯৮৭), যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ (১৯৯৮), শ্রীরামকৃষ্ণ : চিন্তনে ও মননে (২০১১), শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রবাহ : মননভূমি ছুঁয়ে (২০১৩), জগবন্দন (দুই খণ্ডে, ২০১৫)? ইদানীংকালে, ঠাকুরের বিষয়ে অক্লান্তভাবে গবেষণা করেছেন বা করে চলেছেন পূজনীয় স্বামী প্রভানন্দজী, প্রয়াত অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এছাড়া, চেতনানন্দজী মহারাজ স্বয়ংই তো ঠাকুরের বিষয়ে অন্যতম সম্মানিত লেখক, তাঁর বইগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাহলে, বাঙালি লেখক-গবেষকদের আন্তর্জাতিক পাঠকসমাজের সমক্ষে এইভাবে হেয় করা কি ঠিক হল?

এরপরে পূজনীয় মহারাজের কৌতুকপূর্ণ কটাক্ষের লক্ষ হয়েছেন প্রয়াত লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), তাঁর বিখ্যাত 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' বইটির জন্য। যাঁরা জানেন না, তাঁদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, অচিন্ত্যবাবুর পথপ্রদর্শক ছিলেন স্বয়ং শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণাশ্রিত এক মহাসন্ন্যাসী—পরমপূজনীয় স্বামী প্রেমেশানন্দজী মহারাজ। প্রেমেশ মহারাজের জীবনীকার জানাচ্ছেন, "... অনেকেরই জানা নেই যে, অচিন্ত্যবাবুর লেখনী-উৎসারিত ওই শুদ্ধ ভক্তিময় সাহিত্যধারার অন্যতম উৎস ছিল সারগাছিতে—ওই বৃদ্ধ

সন্ন্যাসীর সঙ্গ-সামীপ্যে। সাহিত্যচর্চা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত সাধন-পরিধির অন্তর্গত,—পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রবীণ জিলা ন্যায়াধীশ (District Judge) রূপেই তিনি সরকারি মহলে সমধিক মাননীয় ব্যক্তিত্ব। এ-হেন অচিন্ত্যকুমারকে সারগাছি আশ্রমে প্রেমেশ মহারাজের কাছে সন্তর্পণে আসীন দেখা যেত,— কোনও আসন ছাড়াই খালি মেঝেতে বসে, নানা প্রসঙ্গ করছেন। প্রেমেশ মহারাজ শয্যায় উপবিষ্ট,... যুক্তকরে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত উৎকর্ণ হয়ে তাঁর কথা শুনছেন—হয়তো বা ঠাকুরের কথা কিংবা চৈতন্যদেবের জীবনী।" [*এক সোনার মানুষ*, স্বামী অজজানন্দ, ২০০৬, পৃঃ ৩০০]

অচিন্ত্যকুমার সম্বন্ধে প্রেমেশ মহারাজ একটি চিঠিতে (১৫ সেপ্টেম্বর) জীবনীকারকে লিখেছেন, ''আমার মনে ইচ্ছা ছিল, তুমি অচিন্ত্যবাবুর কাছে নিজে যাও।... এখন দেখিলে,—'মন না রাঙায়ে, কি ভুল করিয়ে কাপড় রাঙালে যোগী'—কথাটির অর্থ অচিন্ত্যবাবুর জীবনে স্পষ্ট দেখা যায়!! আমরা কাজ নিয়া মাতিয়া আছি, আর সে গৃহস্থ বেটা ঠাকুর নিয়া মাতিয়া আছে!!' [তদেব, পৃঃ ৩০১]

কাল্পনিক সাক্ষাৎকারে ঠাকুরের জবানিতে মহারাজ লিখেছেন, '...Achintya is a wonderful writer. He has a good command of the language and he can write in an attractive way. In the 1950s, when his book was published, it sold very well. Most people would present Parama Purush [Sri Sri] Ramakrishna to newly married couples, but they did not read it. The bride locked me her glass-covered bookcase to show her friends how spiritual she was. Anyhow, Achintya made a lot of money from that book on me.' [...অচিন্ত্য বেশ ভাল লেখক। ভাষার ওপরে খুব দখল এবং বেশ রসিয়ে লিখতে পারে। ১৯৫০-এর দশকে ওর লেখা বইটি প্রকাশিত হওয়ার পরে এটি খুব ভাল বিক্রি হয়েছিল। অধিকাংশ বিবাহবাসরে লোকে নব বরবধূকে ওই বই উপহার দেওয়া শুরু করল। নববধূরা আমাকে তাঁদের কাচের বুককেসের মধ্যে বন্দী করে রাখতেন, তাঁদের বান্ধবীদের দেখাতেন যে তাঁরা কতখানি ধার্মিক। যাহোক, অচিন্ত্য আমার সম্বন্ধে বই লিখে প্রচুর টাকা পেয়েছিল।] ঠাকুরের মহাভক্ত অচিন্ত্যকুমারের সম্বন্ধে স্বয়ং ঠাকুরের জীবনীতেই এমন লঘু কথা ('যাহোক, অচিন্ত্য আমার সম্বন্ধে বই লিখে প্রচুর টাকা পেয়েছিল') না লিখলেই বোধহয় ভাল হত। তবে একথা সত্য, ইদানীং কালে বহু বাঙালি লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের উপর বই লিখে অর্থ ও নামযশ প্রত্যাশা করেন।

এই 'কাল্পনিক সাক্ষাৎকার'টি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল *উদ্বোধন* পত্রিকার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৭৫তম আবির্ভাবতিথি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যায় (পৃঃ ২৪৩, প্রকাশকাল : ২০১০)। পরে লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে 'ধ্যানলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ' (২০১৬) গ্রন্থে। যতক্ষণ সেটি বাংলা বইতে এবং বাঙালি পাঠকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ততক্ষণ আমরা, বাঙালি পাঠকরা, কিছু মনে করিনি। কারণ, আমরা নিজেদের সম্বন্ধে নিন্দাবাক্য শুনতে অভ্যস্ত (স্বয়ং স্বামীজী আমাদের সম্বন্ধে কোন্ গালাগালিটা দিতে বাকি রেখেছিলেন?)। কিন্তু আজ যখন তাঁর এই লেখাটি ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে সমগ্র বিশ্বের পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, তখন এটি পড়ে বাঙালি ভক্তদের সম্বন্ধে, বাঙালি লেখকদের সম্বন্ধে, প্রয়াত লেখক ভক্তবর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সম্বন্ধে সেইসব পাঠকদের কী ধারণা হবে? পূজনীয় মহারাজের কাছে অনুরোধ, এর পরের সংস্করণে এই বিতর্কিত অংশটি একটু সম্পাদনা করে দেওয়া যায় কি না ভেবে দেখবেন দয়া করে।

পরিশেষে, মহারাজের বলা দুটি মজার (কিন্তু সুগভীর) ঘটনার কথা শুনুন (পৃঃ ৩৭৭)।

মহারাজের একজন বিদেশি খ্রিস্টান বন্ধু মজা করে একটু খোঁচা দিয়ে মহারাজকে বলতেন, ''আপনাদের ধর্মে ঈশ্বরকে বারবার অবতার হয়ে কেন আসতে হয়, জানেন? কারণ, আপনাদের হিন্দুধর্ম হচ্ছে দুর্বল ধর্ম, তাই একে নতুন করে দাঁড় করাবার জন্যে ভগবানকে অতবার করে আসতে হয়। অথচ, বৌদ্ধধর্ম, খ্রিস্টধর্ম বা ইসলামধর্মের ক্ষেত্রে দেখুন। সেখানে ঈশ্বরকে একবারই আসতে হয়েছে। এইসব ধর্মে একজন প্রফেট, একটাই ধর্মগ্রন্থ।'' এই অভিনব অভিযোগ শুনে মহারাজ হাসতে হাসতে তাঁকে বললেন, ''আরে, তোমাদের ধর্মে ঈশ্বর তো ভয়ে আর তোমাদের কাছে আসতে চান না, পাছে তোমরা আবার তাঁকে যন্ত্রণা দিয়ে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরে ফেলো! আর আমরা হিন্দুরা তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, মেরে ফেলি না। আর তোমাদের মধ্যে ঈশ্বর আবার এলেই বা কী হবে বলো? তোমরা তো আর প্রভু যিশু ছাড়া আর কোনও অবতারকে বা প্রফেটকে মানবে না! কিন্তু, আমাদের মধ্যে তিনি যতবার আসেন, যে রূপেই আসেন, আমরা তাঁকে ঠিক চিনতে পারি আর সেই রূপেই তাঁকে পুজো করি। ঈশ্বরও সেটা ভালই জানেন, তাই তিনি আমাদের মধ্যে বারবার আসেন।''

মোক্ষম উত্তর! আমাদের ধর্মে কেন অসংখ্য অবতার আছেন, কেন ঈশ্বর বারবার এই পুণ্যভূমিতে অবতীর্ণ হন, এর রহস্যটা পাশ্চাত্যের অনেক মানুষ হয়তো ঠিকমতো বুঝতে পারেন না। তাঁরা বুঝতে পারেন না যে অবতারের অবতরণ আমাদের ধর্মের দুর্বলতার জন্য নয়। আমাদের ব্যাকুলতাই তাঁকে বারবার টেনে আনে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে। আমরা লীলাময়কে নানাভাবে পেতে চাই, নানাভাবে তাঁর অমৃতবাণী পান করতে চাই। আমাদের সেই প্রার্থনা পূরণ করতে তিনিও আগ্রহী হন বারবার। আমাদের সম্মিলিত প্রার্থনায় দুলে ওঠে আদি-অন্তহীন, অখণ্ডে বিলীন অরূপসায়র, কৃপাময়ের মৃদুল করুণাবায়ের অভিঘাতে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাগরে লীলালহরী ওঠে। ভক্ত-ভগবানের এই অপরূপ লীলারহস্য—'মূর্তি তোমার যুগলসম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে'—পাশ্চাত্যের ভক্তদের পক্ষে বোঝা সহজসাধ্য নয়।

আরও একটা মজার ব্যাপার দেখুন, করুণাময় প্রেমের ঠাকুর শেষ দুবার সশক্তিক এবং সপার্ষদ এলেন এই বহুনিন্দিত হুজুগে এবং ভাবপ্রবণ বাঙালিদের মধ্যেই, একবার নবদ্বীপে আর একবার কামারপুকুরে।

এবারে, দ্বিতীয় ঘটনাটি। লেখকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল রাইমন পানিক্কর নামে এক জেসুইট ধর্মতাত্ত্বিকের (পৃঃ ৩৭৭)। তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, বৌদ্ধধর্মে একটি নির্দেশ (canon) আছে, বড় ভয়ংকর নির্দেশ—''যদি কখনও রাস্তায় তুমি বুদ্ধদেবের দেখা পাও তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মেরে ফেলবে।'' সর্বনাশ! কেন? তাঁর অপরাধ কী? কারণ, তাঁদের মতে, বুদ্ধদেব কোনও ব্যক্তি হতে পারেন না, বুদ্ধত্ব হচ্ছে চরম সত্যের উপলব্ধির অবস্থা। বুঝুন ব্যাপার! শুধু তাই নয়, শ্রীপানিক্করের মতে খ্রিস্টান ঐতিহ্যেও নাকি অনুরূপ নির্দেশ আছে—''যদি তুমি পথে ঘাটে কখনও প্রভু যিশুর দর্শন পাও তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরে ফেলবে।'' এর কারণও তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন মহারাজের কাছে—ভক্ত খ্রিস্টানদের বিশ্বাস, প্রভু যিশুর পুনরুত্থান হয়েছে স্বর্গে, মর্ত্যে নয়। তাই, মর্ত্যলোকে মনুষ্যশরীরে তাঁর পুনরাগমন অসম্ভব!

এবারে শুনুন, চেতনানন্দজীর উত্তর। তিনি সহাস্যে শ্রীপানিক্করকে বললেন, ''আমাদের ধর্মের বিধান কিন্তু তার বিপরীত। যদি কখনও রাস্তায়

ঠাকুরের সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে যায়, তাহলে সেই দুর্লভ সুযোগ হেলায় হারাবেন না, সেই মুহূর্তেই বসে পড়বেন তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিতে। বেশ ভাল কাটবে সময়টা। তিনি আপনাকে অনেক গল্প শোনাবেন, জোক বলবেন, আপনাকে হাসাবেন। এবং আপনি স্বচক্ষে দেখবেন তাঁর ভাবসমাধি! এই হচ্ছে আমাদের ধর্ম, আমরা 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।' "

ভেবে দেখুন, মহারাজ মজা করে কত বড় একটা পথ দেখিয়ে দিলেন! যুগাবতারের সঙ্গে, স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গে বসে বসে আড্ডা! কেন নয়? তিনি তো রসময়, রসস্বরূপ, তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলেছেন (২-৭), ''রসো বৈ সঃ।"

এই অতুলনীয় বইটি আমাদের শেখাবে কীভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বসে বসে আড্ডা দিতে হয়, তাঁর 'কথামৃত' পান করতে হয়, কীভাবে সংসারে থেকে তাঁর ধ্যান করতে হয়। এভাবে কখন যেন আরশোলা কুমুরে পোকার কথা চিন্তা করতে করতে কুমুরে পোকাই হয়ে যাবে। আমাদের সমস্ত সাংসারিক বন্ধন শিথিল হয়ে যাবে, হৃদয়ের সকল ভালবাসা ধেয়ে যাবে কেবল তাঁর পানে। 'যত বাঁধন সব টুটে গো যেন, প্রভু, তোমার টানে, তোমার টানে'—আমাদের এই আকুল প্রার্থনা সফল হবে।

স্বামী চেতনানন্দজীর লেখা বই মানেই তা অসংখ্য চিত্রশোভিত হবেই। এই বইটিও তার ব্যতিক্রম নয়, এতে বিয়াল্লিশটি ছবি আছে। তার মধ্যে আলোকচিত্র, মানচিত্র, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর আঁকা ছবি আছে। মাস্টারমশাইয়ের ডায়েরির সাতটি পাতার দুর্লভ ছবি আছে। কয়েকটি ছবির কথা বিশেষভাবে বলতে হয়। 'লীলাপ্রসঙ্গ' পড়ে আমরা জেনেছি যে ঠাকুরের মায়াশরীর ভূমিষ্ঠ হয়েছিল একটি 'ক্ষুদ্র চালাঘরে' যার 'একপার্শ্বে ধান্য কুটিবার জন্য একটি ঢেঁকি এবং উহা সিদ্ধ করিবার জন্য একটি উনান বিদ্যমান ছিল।' সেটি অনেক আগেই কালের করাল গ্রাসে পড়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু পূজনীয় লেখকের কৃপায় আমরা সেই ঐতিহাসিক সূতিকাগৃহের একটি আলোকচিত্র পাচ্ছি এখানে (পৃঃ ১৩৬)। আচ্ছা, ভাবতে পারেন, ঠাকুরের সময়ে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী কেমন ছিল? সেই কৌতূহলও মহারাজ মিটিয়েছেন, ১৮৯৬ সালের পঞ্চবটীর একটি ছবি পাওয়া যাবে এই বইতে (পৃঃ ১৫৯)। আর, ঠাকুরের ষোলোজন সন্ন্যাসী শিষ্যের গ্রুপফোটো কি কেউ কখনও দেখেছেন? না, এইরকমের কোনও ছবি কখনও তোলা হয়নি। কিন্তু সেই ছবিও এই বইতে পাবেন (পৃঃ ১০৫)। কীভাবে সম্ভব হল? আজ কম্পিউটারের যুগে সবই সম্ভব। গ্র্যাফিকশিল্পী মিস ডায়ানে মার্শাল সেরকম একটি ছবি সৃষ্টি করেছেন।

বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে এই বইটির জ্যাকেটের কথা। জ্যাকেটের প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছে ঠাকুরের মুখচ্ছবি। আমেরিকান সন্ন্যাসী স্বামী তদাত্মানন্দজীর (১৯৩২-২০০৮) আঁকা এই ছবিটি আমাদের পরিচিত। 'ধ্যানলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ' বইয়ের জ্যাকেটেও এই অপরূপ ছবিটি ছিল, এখানে সেটিই ছাপা হয়েছে উন্নততর মুদ্রণ-প্রযুক্তির সাহায্যে। ছবিটি বিশ্ববিখ্যাত ডাচ শিল্পী রেমব্রান্ট-এর (১৬০৬-১৬৬৯) স্টাইলে অঙ্কিত। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে কিছুটা আলো গিয়ে পড়েছে ঠাকুরের মুখের ওপর, তাঁর দিব্য শরীরের বাকি অংশ রহস্যময় অন্ধকারে আবৃত। তাঁর 'স্নেহবিহ্বল করুণা-ছলছল' আঁখি দুটি যেন আমাদের কাছে চিরন্তন এক আশ্বাসের বার্তা বহন করে আনছে—''নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা।/ মন রে মোর পাথারে হোস নে দিশেহারা॥"

এই সুমুদ্রিত, দৃষ্টিনন্দন এবং সে-কারণে অবশ্যই ব্যয়বহুল বইটি প্রকাশ করেছেন সেন্ট লুইস বেদান্ত সোসাইটি। সোসাইটির সদস্যদের এজন্য সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ। এই বইটি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের নিত্যপাঠ্য হওয়া প্রয়োজন। আশা করছি, আমাদের জন্য শীঘ্রই এর একটি ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হবে। ✠